শিল্পের খোঁজে

সুধীর চক্রবর্তী। লোক সংস্কৃতি গবেষক হিসাবে তিনি সুপরিচিত। কেন এবং কেমন করে তিনি শিল্পের লোক হয়ে উঠলেন তারই কাহিনী তাঁর নিজের কলমে। সঙ্গে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভগ্নাংশ। এই প্রথম এই ব্লগ-সাইটে।

আমরা যে সময়ে জন্মেছি তখন ভারত পরাধীন দেশ। সে যুগের সমাজ ও পরিবারের যে চেহারা সেখানে শিল্পকলাচর্চার খুব একটা আনুকূল্য ছিল না। সেটা দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকটা হয়েছে। ছোটবেলায় আমরা খানিকটা কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছি বলে চিত্রকলার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হওয়াটা কঠিন ছিল। যেমন, আমাদের কোনও কালার-বক্স ছিল না। কালার-বক্স কিনে দেবে এমন কোনও আত্মীয়স্বজনও ছিল না। অস্বচ্ছলতার মধ্যে আমরা রঙকে চিনেছি। আমি আর আমার এক দাদা দু'জনে ছবি আঁকতাম। নিজে নিজেই আঁকতাম, কেউ আমাদের শেখায়নি। কিন্তু এটা প্রতীতি হয়েছিল খুব ছোটবেলাতেই যে ওই একটা বেগুন আঁকো, কাঁচকলা আঁকো — এটা কোনও আর্ট নয়। যদিও তাতে নাকি ড্রয়িং-এ দশে দশ পাওয়া যেত। আমরা হয়তো সেখানে কম নম্বর পেতাম। অথচ ছবি সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল মনের ভেতরে। আমি আর আমার দাদা পোর্ট্রেট স্টাডি করতাম। পেনসিল দিয়ে, রঙে নয়। রঙ কোথায় পাবো? দেওয়ালে একটা আর্ট পেপার সেঁটে ছবির ওপর একটা গ্রাফ করে সেটাকে এনলার্জ করে নিয়ে আমরা পোর্ট্রেট করতাম। ছোটবেলা থেকেই আমার নানারকম ছবি আঁকার চেষ্টা ছিল। ঠাকুর-দেবতার ছবি খুব আঁকতাম। আবার এমন হয়েছে হয়তো কখনও একটা পিঁড়ে পেয়ে গেলাম, মা আমাকে ময়দা মেখে দিলে তার ওপর ময়দা দিয়ে একটা দুর্গা ঠাকুর বানিয়ে ফেললাম। এইসব করতে করতে আমরা দেখলাম রঙের খুব অভাব। ভেবেচিন্তে দেখা গেল হলুদবাটা দিয়ে একটা রঙ হতে পারে, মায়ের আলতা দিয়ে লাল, তার মধ্যে চুন দিলে গোলাপি। হলুদের সঙ্গে নীল মেশালে সবুজ বেরিয়ে আসে। এইভাবে রঙ তৈরি শেখা গেল নিজের বাড়িতেই। আর সেই রঙ দিয়েই আমরা রঙিন ছবি আঁকতাম। পরে যখন লোকশিল্প নিয়ে কাজ করতে গেলাম তখন দেখলাম চালচিত্র-শিল্পীরাও আমাদের ছোটবেলার মতো একই সমস্যায় পড়েছে। আর তার সমাধান তারা করেছে একেবারে প্রাকৃতিক উপায়ে। যেমন ওরা বলল — দীর্ঘদিন ধরে রান্না করতে করতে উনুনের যে ঝিকগুলো ক্রমাগত আগুন লেগে লাল হয়ে যায় সেখান থেকে তারা

লাল রঙ বের করে। পুঁইমেচুরি থেকে বেগুনি রঙ বের করে, সিমগাছের পাতা থেকে সবুজরঙ বের করে। উঁচু পাহাড়ে কোথাও একটা পাথর থেকে নাকি একধরণের নীল রঙ পাওয়া যেত। এইসব রঙ দিয়েই তখনকার দিনে পটের ছবি আঁকা হত। আমরা যখন ছবি আঁকছি কৈশোরে আমাদের সামনে উপাদান আর কি? পেনসিল রবার, কাগজ আর কিছু ভেজিটেবল কালার। এই করতে করতে ছবি দেখার চোখ তৈরি হল। তখন বাড়িতে বসুমতী আর ভারতবর্ষ পত্রিকা পড়তাম। তারমধ্যে রঙিন ছবি ছাপা হত। আমার আজও মনে আছে, সেখানে আমরা রবি বর্মার ছবি দেখেছি। রামগোপাল বিজয়বর্গী বলে একজনের আঁকা ছবি খুব ভালো লাগত। মনীন্দ্র গুপ্তের ছবি থেকে আরম্ভ করে বেঙ্গল স্কুলের অনেক শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেছি। এখন বুঝতে পারি সেগুলো বেঙ্গল স্কুল শৈলী, তখন তো ওসবের চেতনা ছিল না। সেই ছবিগুলো দেখতে দেখতে ছবি সম্পর্কে একটা অসম্ভব উৎসাহ জেগে যায়। আমি নিজে যে ছবি আঁকতাম সেকথা আগেই বলেছি। যেমন ধরা যাক, কোথাও একটা একজিবিশন হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নিয়ে। সেখানে আমাকে হয়তো আঁকতে দেওয়া হল প্রফুল্ল চাকি, বাঘা যতীনের ছবি। আমি আঁকলাম, আমার দাদাও আঁকলো। সেরকমভাবে কিছু পোর্ট্রেট আমি এঁকেছি। তারপর যখন কলেজে উঠলাম দেখা গেল যে কলেজে চিত্র-প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আমি তাতে নাম দিয়ে দিলাম। সেখানে আঁকলাম বুদ্ধদেব বসে আছেন, তলায় একটি পূজারিণী তাঁকে প্রণাম করছে। সেই ছবি এঁকে ফার্স্ট প্রাইজও পেয়ে গেলাম। এইভাবেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার অবধি প্রাইজ-টাইজ পেলাম। তারপর দেখলাম একসঙ্গে অনেকগুলো নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না। ছবি আঁকব, গান গাইব, সাহিত্য করব, পড়াশোনাতেও ভালো হব, এতকিছু তো হয় না। কিছু কিছু জিনিস ত্যাগ করতে হয়। আমি জীবনে দুটো জিনিস ত্যাগ করেছি। একটা হচ্ছে ছবি আঁকা, আর একটা হল গান গাওয়া। কারণ আমাদের সময়ে শুধু পড়লে হত না, সফলতা এই পর্যায়ে হওয়া দরকার ছিল যাতে চাকরিটা সঙ্গে সঙ্গে হয়। তখনকার দিনে কোনও কমিশন-টমিশন ছিল না। মেধার ওপরেই চাকরি হত। যে ফার্স্ট হল সে প্রথম চাকরি পাবে, সেকেন্ড পাবে তারপরে। আমার মনে আছে আমার বন্ধু শিশির দাশ ফার্স্ট হয়েছিল, সে প্রথম চাকরি পেয়ে গেল, তারপর আমি পেলাম। আমি একসঙ্গে তিন-চারটে চাকরি পেয়েছিলাম। আমি যেটা নিলাম না, সেটা আমার এক বন্ধু পেল।

ছবি আঁকার জগৎটা প্রথম আমার কাছে খুলল যখন আমি এম.এ. পড়তে যাই। সে সময় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়তে যেতাম। পড়তে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটা আলাদা জায়গায় খোলা আলমারিই ছিল যেখানে পৃথিবীর সমস্ত গ্রেট মাস্টার্সদের ছবির অ্যালবামগুলো ছিল।

আমার কাজ ছিল লেখাপড়ার ফাঁকে সেইগুলো পড়া। সেইসব পড়ে ছবি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হল। ছবি কতরকমের হয়, ছবির ব্যাপারগুলো কি, রঙ কি, রেখা কি, অয়েল পেইন্টিং কি — সব একে একে বুঝতে শিখলাম ওই অ্যালবামগুলো দেখে। যেহেতু বিশ্বের শ্রেষ্ঠশিল্পীদের অ্যালবাম দেখেই মানুষ হয়েছি সেহেতু মনের ভাবটা বেশ উঁচু তারেই বাঁধা হয়েছিল বলা যায়। ওই সময়েই ভ্যান গঘ, লুত্রেক কিংবা গগাঁ সম্পর্কে যে সব উপন্যাসগুলো আছে সেগুলো পড়ে ফেলি। সেগুলো পড়ার ফলে রেনেসাঁস এবং তার পরবর্তী যুগের ছবি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হল। যেমন আমি জানলাম ভ্যান গঘের সূর্যমুখী ছবিতেই নাকি প্রথম সূর্যের আলো ওপর থেকে এসে পড়েছে। ওপর থেকে আলো এসে পড়ার ব্যাপারটা সেই প্রথম আমি জানলাম। আমরা যখন ছবি আঁকছি আমাদেরতো তখন আলোছায়াটা বোঝায়নি কেউ। তখন স্কেচ করাটাই বড় কথা ছিল। কিন্তু পরে দেখেছি কত কিছু। পারস্পেকটিভ বলে একটা কথা শিখলাম, আলোছায়ার খেলা শিখলাম। কার মুখে কতটুকু আলোর প্রক্ষেপ হবে, কোন জিনিসটা প্রমিনেন্ট করা হবে এসব জিনিসগুলো ছবি দেখে দেখেই শেখা। শেখা মানে কিন্তু প্রয়োগ নয়। কারণ আমি তো আঁকছি না। আমার জীবনটা তো তখন লেখাপড়ার জগতে চলে গেছে। কিন্তু তাই বলে ছবির সঙ্গে সংসর্গ নষ্ট করার তো কারণ নেই কোনও। কাজেই প্রত্যেক বছর কলকাতায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে যে ছবির একজিবিশন হত সেটা দেখতে কখনও ভুল হত না। প্রত্যেক বছরই শীতকালে সেখানে গিয়ে ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখতাম। ফলে তখনকার দিনে প্রদোষ দাশগুপ্তের সঙ্গে গোপাল ঘোষের কী পার্থক্য সে জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছিল। কোনটা ভাস্কর্য কোনটা ইনস্টলেশন এসব বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়েছিল একজিবিশনগুলোতে গিয়েই। আগেকার দিনে কেন এখনও অনেক প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখি ঘরের মাঝখানে একটা ইনস্টলেশন থাকে। এসব কনসেপ্টগুলো কিন্তু আমাদের কেউ বোঝায়নি। ক্লাশ মের আলোচনাতে তো এসব প্রসঙ্গ আসে না। আমার সহপাঠীরাও যে এগুলো জানতো তা নয়। আমার কাছে আর্টের একটা জানলা কেমন করে খুলে গিয়েছিল বলে গোপাল ঘোষ থেকে আরম্ভ করে প্রচুর শিল্পীর সঙ্গে আমার দেখাশোনা হয়েছিল। আমি অনেক সময় এঁদের বাড়ি চলে যেতাম। গিয়ে বলতাম আপনার ছবি

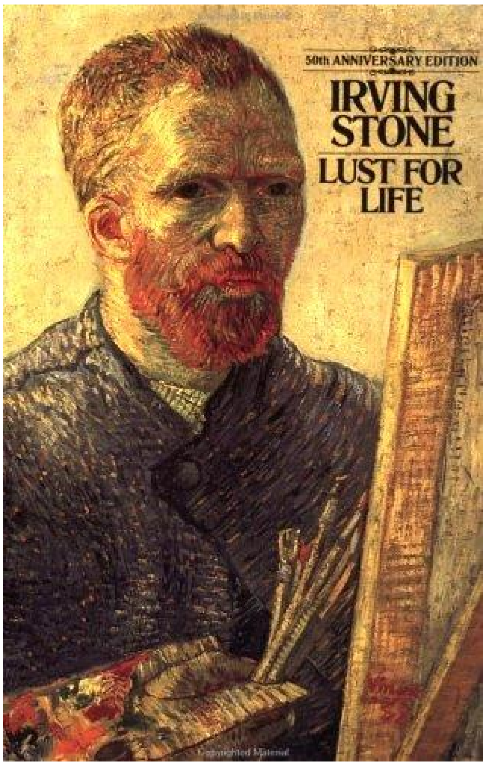

দেখান। তাঁরা অনেক সময় দেখাতেনও। দেখতাম আর সেইসব কাজগুলো বোঝার চেষ্টা করতাম। এইভাবেই অনেক পরে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক অসাধারণ শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন আমার একটা বই ‘নির্বাস’ বের হবে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন — ‘পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে আপনার বইয়ের ইলাস্ট্রেশন আঁকানো হবে। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু তাগাদা মারবেন।’ পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারের কাছে প্যাটেলনগর বলে একটা জায়গায়। তখন আমি বাউল-ফকিরদের নিয়ে কাজ করছি, কাজেই বীরভূম যাওয়াটা কোনও সমস্যা নয়। আমি প্যাটেলনগরে চলে গিয়ে পঙ্কজবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি সত্যিই একজন গ্রেট আর্টিস্ট, কিন্তু অসম্ভব অবহেলিত। তিনি একটা বেসিক স্কুলে ছবি আঁকা শেখান। নিজে তিনি ছবি আঁকা শিখেছেন শান্তিনিকেতনে এবং গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। তাঁর মাস্টারমশাই বলতে নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, বসন্ত গাঙ্গুলি, অতুল বসু। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি আঁকতেন বাউল-ফকিরদের। তাঁর বাড়ি ভর্তি ছবি। তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সকালবেলায় তাঁর ছবির ওপর ধুনো গঙ্গাজল দিতেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম ‘ছবিগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ...।’ তিনি বললেন ‘ তা হোক। ছবি আমি বিক্রি করবো না।’ এদিকে ছেলেরা বলছেন তার বাবার চরম দারিদ্র্য। কত লোক ছবি কিনতে আসে। উনি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। তা সেই পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা একটা বাউলানির ছবি আমার আজও মনে আছে। সেই বাউলানি তাকিয়ে আছে, তার চোখটা লাল। সে ধূমপান করছে, তার এই সিগারেটের মুখে একটা লাল রঙ আছে। যে আলোটা সে জ্বেলেছে তারও একটা লাল আছে। তিনটি লালই উনি আলাদাভাবে এঁকেছেন, সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর আঁকা ছবিগুলো কিন্তু অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেল। কারণ পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি কেউ উদ্ধার করেননি। হাজার হাজার ছবি ছিল তাঁর। তিনি জীবনে যত সন্ন্যাসী এবং বাউলদের দেখেছেন প্রায় প্রত্যেকের পোর্ট্রেট তেলরঙে এঁকেছেন। মূল্যবান সেই সংগ্রহ মহম্মদবাজারের কাছে প্যাটেলনগরে হয়তো তাঁর বাড়িতে এখনও ডাঁই

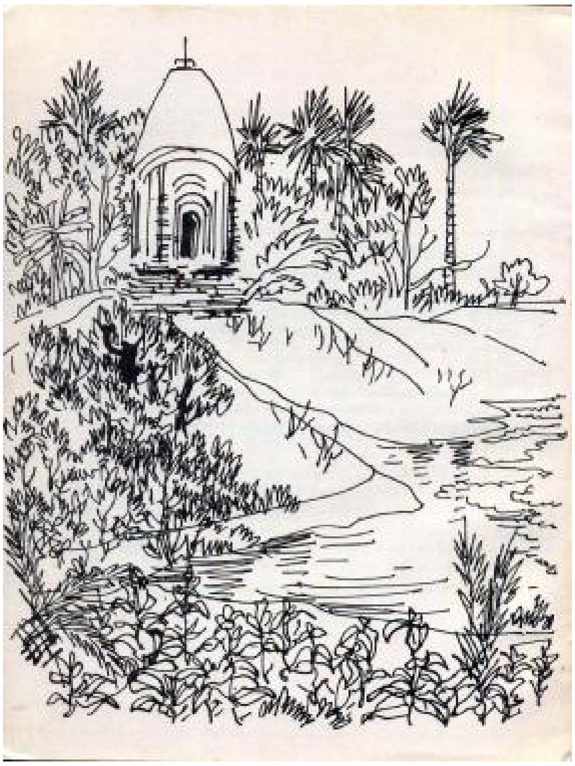

হয়ে পড়ে আছে। কারো কোনও চেতনা নেই। সেই মানুষটি আমাকে একটি আশ্চর্য কথা বলেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম ‘আমার লেখা যে এত পড়লেন, ছবি আঁকলেন, পড়ে কি মনে হল?’ তিনি আমাকে বললেন ‘হ্যাঁ, আপনার হবে মনে হয়।’ এই কথাটা যখন তিনি আমাকে বলছেন তখন আমার পনেরোখানা বই বেরিয়ে গেছে। আমি দেখলাম শিল্পীর কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় খুব কঠিন কাজ। আমার কিন্তু মানুষটার কথাটা খারাপ লাগেনি।

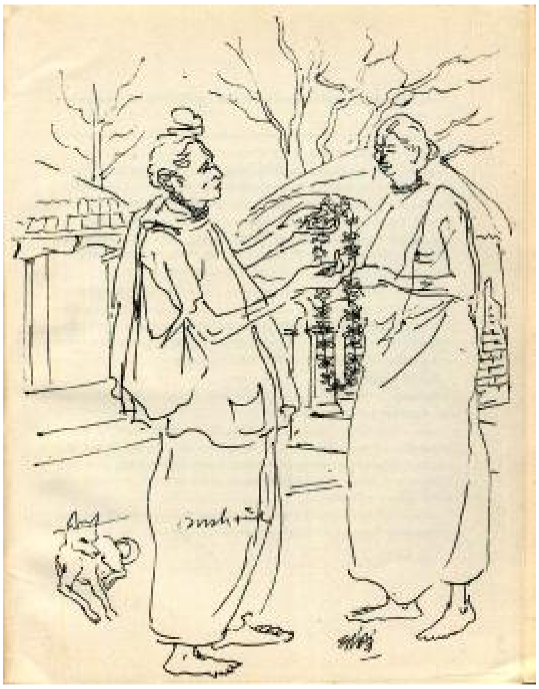

শিল্পীদের সংস্পর্শে এলে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েই যায়। যেমন, আমাদের বাড়ির পাশে একটি কুমোরপাড়া ছিল। আমার কাজই ছিল সকালবেলায় লেখাপড়া করে সেখানে ছুটে চলে যাওয়া। ঠাকুর গড়া হত, গোপীনাথ পাল বা গোপে পাল নামে যিনি ছিলেন তাঁকে আমি সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। তিনি সরায় রঙ গুলতেন, আমাকে হয়তো দু’চারটে কাজ দিতেন। বলতেন ‘এইখানটায় একটু রঙ মারো।’ অনেকদিন দেখার পর তবে একটু-আধটু অধিকার পেয়েছিলাম অবশ্য। মাটির মূর্তি, তার ডাইমেনশন, মাটি তৈরি করার কৌশল, আঙুল কীভাবে গড়তে হয়, কী করে ঠাকুরের একমেটে থেকে দোমেটে করতে হয়, মূর্তির গায়ে ফাটল ধরে গেলে কীভাবে সেখানে ন্যাকড়া কাদায় গুলে লাগাতে হয় এইসব কলাকৌশল আমি ওঁর কাছেই শিখি। এইসব অভিজ্ঞতাগুলো ‘কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প’ লেখার সময় কাজে লেগে যায়। কৃষ্ণনগরের যেসব মৃৎশিল্পীরা চার থেকে ছয় ইঞ্চি মাপের ছোট মূর্তি অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে বানাতে পারতেন সেইসব মানুষদের সঙ্গে জীবনের একটা অংশ আমি কাটিয়েছি। আর একটা অংশ কাটিয়েছি যারা চালচিত্রের ছবি আঁকে। তাদের জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। কত কী জেনেছি। চালচিত্রের ছবি যাতে ফেটে না যায় সেজন্য তারা তেঁতুলবিচির আঠা তৈরি করে

তাতে লাগায়। বীরভূম অঞ্চলে তেঁতুলগাছ নেই বলে সেখানকার শিল্পীরা বেলের আঠা ব্যবহার করে। বীরভূমেরই এক গ্রামে দেখেছিলাম সেখানকার শিল্পীরা চালচিত্রের ছবি আঁকছেন খুব তীব্র রঙে। জিজ্ঞেস করলাম 'এত তীব্র রঙ কেন?' শিল্পী বললেন 'ওটা একবছর পরে বিসর্জন হবে যে। যদি হাল্কা রঙে আঁকি তাহলে তো এটা ততদিন থাকবে না।' সেই গ্রামে ছ-সাতটা বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়, সবই পটে আঁকা মূর্তি। সেগুলো একবছর থাকে, তারপর বিসর্জন দেওয়া হয়। সেখানেই এক জায়গায় দেখলাম চালচিত্রের মধ্যে শিবকে শুইয়ে আঁকা হয়েছে। এটা নিয়ে আমি অন্য জায়গায় লিখেছি। চালচিত্রের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে শিব শুয়ে আছে। আমি বললাম 'শিবকে শুইয়ে দিয়েছেন কেন? সে কী গাঁজা খেয়ে শুয়ে পড়েছে নাকি?' তিনি বললেন 'না না, বসিয়ে দিলেই তো পাশে আবার অনেকগুলো ফিগার আঁকতে হবে। অত টাকা তো দেয়নি।' এই যে কথাটা সে বলল, এ যে কী আশ্চর্য একটা উপলব্ধি! ফিল্ড ওয়র্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পুরস্কার বা প্রাপ্তি কিন্তু এগুলোই। আমি বাড়িতে বসে কোনওদিন এই সংলাপটা তৈরি করতে পারতাম না। ওঁর কাছ থেকে এটা পেলাম।

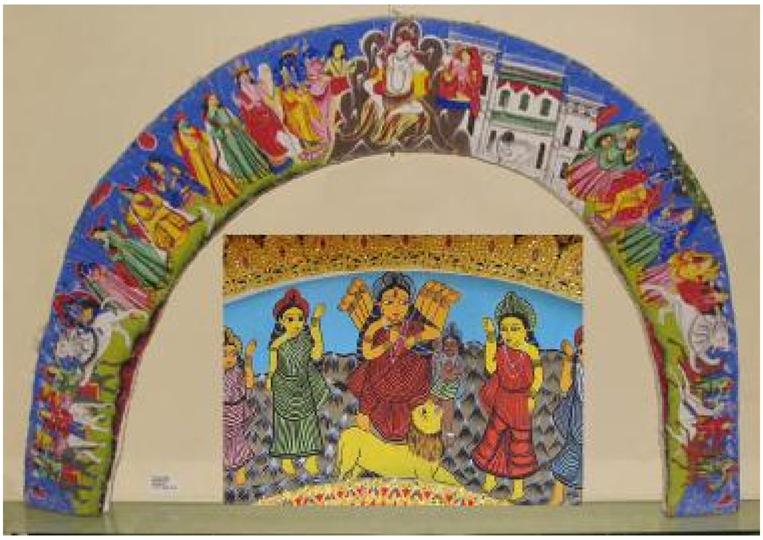

অনেকদিন আগের কথা হঠাৎ মনে এল। ১৯৬১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ, তার কিছু আগে সত্যজিৎ রায়কে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা বিশেষ কাজ দিয়েছিল – রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি তথ্যচিত্র তিনি তৈরি করবেন। সত্যজিৎ রায় তখন রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলো দেখবার জন্য একবার রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে এসেছিলেন। তখন রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি হয়নি। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে আমার বন্ধু অসীম ঘোষ কাজ করতো। আমি ওর ওখানে গিয়ে আড্ডা মারতাম। একদিন ও বলল 'এই বোসো, সত্যজিৎ রায় আসছেন।' সত্যজিৎ রায় এসে বললেন 'এখানে নাকি রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি আছে? একটু দেখতে এসেছি।' দেখলাম বিরাট সব কাচের ওপর ছবি রেখে তার ওপর আরেকটা করে কাচ রাখা। এইভাবে ছবিগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। উনি ছবিগুলো নিয়ে দেখতে লাগলেন, আর চা খেতে লাগলেন। আমার সঙ্গে এমন করে আলাপচারি করলেন যেন আমার সঙ্গে ওনার খুব

চেনাশোনা। অথচ জীবনে সেটাই প্রথম দেখা হয়েছে। আমি কে তাও উনি জানেন না। উনি কে, সেটা অবশ্য আমি জানি। একমনে ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ছবি দেখে উনি বললেন ‘এত উজ্জ্বল রঙে আঁকা! আচ্ছা, এই ছবিটার কি বৈশিষ্ট্য আপনি দেখছেন বলুন তো?’ এমনভাবে তাকালেন যেন আমি খুব বিশেষজ্ঞ। আমি দেখলাম আমাকে উনি বিশেষজ্ঞ ভেবেছেন যখন তখন আমিও একটু বলি। আমি বললাম, ‘ডিপ ভায়োলেটের ওপর ডিপ রেড, এত ডিপ রঙ পাশাপাশি সাধারণত ছবিতে তো হয় না। এখানে এমন কেন তা তো বুঝতে পারছি না। অথচ ছবিটা মারও খাচ্ছে না। ভেতর থেকে কীরকম একটা গ্লেজ আসছে।’ সত্যজিৎ বললেন ‘দাঁড়ান আমি দেখি।’ এই কথা বলেই যেহেতু উনি সত্যজিৎ রায় সেইহেতু উনি ছবিটা একটু খুঁটে দেখলেন। দেখা গেল পুরো একটা রাংতার ওপর ছবিটা আঁকা হয়েছে। রাংতার ওপর আঁকা বলেই ছবিতে অত গাঢ় রঙ দেওয়া হয়েছে। উনি বললেন ‘বুঝলেন ছবি আঁকার বেস বা জমি একটা বড় ব্যাপার।’ তা-তো বুঝলাম। ওঁর পাশে বসেই সেটা বুঝলাম। উনি খুঁটে দেখালেন বলেই রাংতাটা দেখতে পেলাম। আমি তো অন্যভাবে এটা বুঝতে পারতাম না। শুধু মনে হত কোনও এক পাগলামির বশে এত ডিপ রঙ পরপর লাগানো হয়েছে। এটাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার একটা কায়দা। এই ছবিটা পরে আর কোথাও কখনও দেখিনি। কোনও অ্যালবামে এটা আসেনি।

চিত্রকলা সংক্রান্ত আমার অভিজ্ঞতাকে আমি চারভাগে ভাগ করি। একটা হল চিত্রকলা বিষয়ক অনেক বইপত্র পড়েছি। দুই হচ্ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজ প্রায় সবই অ্যালবামে দেখেছি। সব শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের ছবিই ন্যাশনাল লাইব্রেরির আলমারিতে ছিল এবং সেগুলো আমাদের হাতের সামনেই ছিল। এখন হয়তো আর নেই। তৃতীয় হচ্ছে, যাঁরা সত্যিকারের শিল্পী তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। তাঁরা যখন ছবি আঁকছেন তখন তাঁদের সামনে হাজির হয়েছি কখনও সখনও। চতুর্থত, যাঁরা লোকশিল্পী তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। এই মেশার সুযোগে অনেক জিনিস জানতে পেরেছি। যেমন এত বড় যে একটা চালচিত্রশিল্প, সে যে খবরের কাগজের ওপর আঁকা হয় সেটা তো আমি জানতাম না। খবরের কাগজকে অর্ধবৃত্তাকারে কেটে তার ওপর সাদা রঙ মেরে তারপরে ফিগারগুলো আঁকা হয়। একেবারে সরাসরি রঙ দিয়ে আঁকা, পেনসিলের কোনও ব্যাপারই নেই। একটা চালচিত্রের দাম ছিল তখন তিনটাকা, সেটা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পাঁচটাকা করে বেচা হত – পাইকারি দর। একটা ঝুড়ি করে হয়তো প্রায় পাঁচশোটা চালচিত্র নিয়ে গিয়ে একজন কুমোরটুলিতে দিয়ে দিল। তিনটাকাটা পাঁচটাকায় উঠল এই পর্যন্ত, শিল্পীদের কিছু উন্নতি

হল না। আমার সঙ্গে শ্যাম পাল নামে একটি লোকের আলাপ ছিল, খুব বৃদ্ধ। আমি একবার তাঁর কাছে গিয়ে বললাম 'আমাকে একটা দশাবতার পট এঁকে দেবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ দেব। অষ্টসখীও একটা এঁকে দেব।' উনি অর্ধবৃত্তাকারে না এঁকে লম্বা করে কাগজ কেটে আয়তাকারে আমাকে পট এঁকে দিলেন। তাঁর ছবিতে দেখলাম দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ অবতারের ছবিটা ঠিক বুদ্ধদেবের মতো নয়। একটা জটাজুটধারী লোক, পৈতে পরা একজন ব্রাহ্মণ। আমি তাঁকে বললাম 'বুদ্ধ এমন কেন?' উনি বললেন, 'বুদ্ধ তো একজন হিন্দু রাজা, সিদ্ধার্থ। গৌতম বুদ্ধ কেন হতে যাবে? আমরা যখন হিন্দুপট আঁকছি তখন তার মধ্যে বৌদ্ধ ছবি দেব কেন?' এই কথাটায় আমি বুঝতে পারলাম যে পটুয়াদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে। একটা বিপ্লবও আছে। আমরা তার খবরও রাখি না। এই যে শ্যাম পাল অত্যন্ত নিভৃতে একটা বুদ্ধের জায়গায় এরকম এক সিদ্ধার্থ এঁকে ফেললেন, গৌতম বুদ্ধের বদলে রাজা শাক্যসিংহ, পৈতেধারী ব্রাহ্মণ, তার মানে সে কিন্তু হিন্দু-মিথোলজির মধ্যে ঢুকে গেছে। এই জায়গাটা আমাকে খুব চমকে দিয়েছিল। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করলাম 'কত দাম দেব?' তিনি বললেন 'তিনটে টাকা দিন।' আমি বললাম 'তিন টাকা আপনাকে দিতে ইচ্ছে করছে না, আমার কিছু বেশি দিতে ইচ্ছে করছে। অষ্টসখী আর দশাবতার এই দুটো ছবির জন্য আপনাকে আমি কত দেব বলুন?' তিনি বললেন 'কত দেবেন, আচ্ছা তাহলে এক কাজ করা যাক। আপনাকে আমি একটা প্রেসক্রিপশন এনে দিচ্ছি, আপনি আমাকে একটা ওষুধ এনে দেবেন? আমার খুব হাঁপানি ও আরো নানারকম রোগ আছে তো। প্রেসক্রিপশন ডাক্তার করে দেয়, কিন্তু ওষুধ কেনার তো পয়সা পাই না।' আমি তখন ওষুধগুলো কিনে দিলাম। সাকুল্যে চোদ্দটাকা লাগল। উনি বললেন 'এ যে কী বিরাট উপকার করলেন!' তখন আমার মনে হল একদিকে আমার দেশ, একদিকে আমার শিল্প, আর একদিকে আমি। কিন্তু আমারতো কিছু করণীয়ও নেই। আমি তো এঁদেরকে বাঁচাতেও পারবো না। অবশ্য একটা কাজ আমি করতে পারলাম। করলাম কী 'চালচিত্রের চিত্রলেখা' নামে একটা বই লিখে ফেললাম। সেই বইটা এই বিষয়ে একমাত্র বই এখনও পর্যন্ত। 'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী' বইটা নিয়ে চারবছর ধরে কাজ করেছিলাম। এই বইটা করেও আমার মনে হয়েছিল বোধহয় কিছু একটা করতে পারলাম। অন্তত একটা ডকুমেন্টেশন তো থাকল। সেই কাজ করতে গিয়েও তো কত অভিজ্ঞতা। ঘুর্ণির এক মহিলা মৃৎশিল্পীকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আপনার তো চারটে ছেলে, তা আপনি নিজে ছবি আঁকা শিখলেন কোথায়, কীভাবে?' উনি বললেন 'বিয়ের আগে জানতাম না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসব শিখেছি।

এখন কাজ করছি, আর আমার চারটে ছেলের মধ্যে তিনটে ছেলে এ কাজ করে। আর একটা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি।' আমি বললাম 'কেন?' তিনি বললেন 'আমাদের এই কাজ অত্যন্ত অপমানজনক। এতে না আছে টাকা না আছে সম্মান। একটা ছেলের সম্মান একটু হোক অন্তত।' আবার এমন বাড়িতে গিয়ে দেখেছি যেখানে সবাই লেখাপড়া শিখছে আর একটা ছেলে শিল্পকাজ করছে। তার মায়ের বক্তব্য – এ ছেলে তার বাবার পাশেই থাক। বংশের একটা ধারা তো, লেখাপড়া না করে সে ছবির মধ্যেই থাকুক। আমার এক বন্ধু ছিল বীরেন পাল, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে সে মূর্তিগড়ে। তার বাবা নরেন পালকে দেখেছি আপনমনে একটা টুলের ওপর বসে মাটির কাজ করছেন। তাঁর পরণের ধুতিটা খুলে গেছে, তিনি উলঙ্গপ্রায়। আমি তাঁকে বললাম 'কাকাবাবু আপনারতো কাপড়টা খুলে গেছে।' উনি বললেন 'ওসব দিকে নজর রাখলে বাবা কাজ হয় না।' আর বীরেন পাল আমাকে বলেছিল 'জানো তো শিল্পী যত বড়ই হোক সে কিন্তু আরেকজন শিল্পীকে খুব হিংসে করে। এই যেমন নরেন পালকে দেখছ আমার বাবা, ইনি কিন্তু আমায় কিচ্ছু শেখাননি। কারণ উনি জানতেন আমি ভালো কাজ পারবো। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওঁকে পিছন থেকে দেখে কাজ করতে শিখেছি, ওঁকে না জানিয়ে অন্ধকারে। উনি লম্ফ জ্বালিয়ে কাজ করছেন আর আমি পাশের ঘর থেকে দেখছি। এভাবে কাজ শিখে নিয়েছি।' এভাবেও আমি শিল্পীমহলের কথা জেনেছি।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। একবার আমি সস্ত্রীক গিয়েছিলাম বাঁকুড়ার ঘোড়াগুলো যেখানে হয় সেই পাঁচমুড়ো গ্রামে। সেখানে গিয়ে প্রথমে তো একটা শোরুমে ঢুকলাম। সেখানে ঢুকে সব মূর্তিটুর্তি দেখছি। দোকানের লোকটিকে বললাম 'আপনাদের এখানে একটু চা-মুড়ি খাওয়া যায় না? সে তো অভিভূত হয়ে পড়ল। দুজন শিক্ষিত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা এসে চা-মুড়ি খেতে চাইছে। 'আপনি আমাদের বাড়িতে চা-মুড়ি খাবেন?' আমি বললাম 'শুধু চা-মুড়ি কেন? আপনাদের বাড়িতে আমরা ভাতও খাবো।' লোকটিতো চমকে উঠল – 'অ্যাঁ, তাহলে তো আপনাদেরকে আমাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে হয়।' আমি আমার স্ত্রীকে বলেই রেখেছিলাম – তোমার কাজ হচ্ছে কিন্তু বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলা। এটা আমি বলতে পারবো না। কারণ ওরা তো কথা বলবে না আমার সঙ্গে। ও গিয়ে যথারীতি ফিল্ড-ওয়র্ক করে ফেলল আমার হয়ে। সেখানে দেখা গেল আমরা এসেছি বলে একটা ল্যাটা মাছ তারা জোগাড় করে রান্না করার চেষ্টা করছে। মাছটা ওরা ছাই দিয়ে মেখে কাটল, কিন্তু ধোয়াধুয়ির কোনও ব্যাপার নেই। আমার স্ত্রী আমাকে বললেন 'এরা তো দেখছি মাছ জলে ধোয় না। আমি এটা খাবো না।' তখন আমি বললাম

‘দেখুন আমার স্ত্রী কিন্তু মাছ খান না।’ তাঁরা বললেন ‘ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা ডিম করে দিচ্ছি।’ ফলে আরও করুণ অবস্থা হল। একটা কড়াইয়ের মধ্যে তেল ছাড়াই সেখানে ডিমটাকে আচ্ছা করে সেঁকে কুচকুচে কালোরঙের একটা বস্তু নিয়ে এল। আর মাছটা যে কেন ধোওয়া হল না সেটা পরে জানলাম। ধোবে কি করে, তাদের বাড়িতে তো কোথাও জল নেই। তারপর গিয়ে দেখলাম একটা বিশাল বালিয়াড়ির মধ্যে একটা গর্ত করে সেখানে তারা বাটি পেতে দিয়েছে, তার মধ্যে টুপটুপ করে জল পড়ছে। হয়তো আধঘন্টায় একবাটি জল হয়। এ অবস্থায় তারা কেমন করে মাছ ধোবে? হাত দিয়ে মাছটাকে মুছে ওরা কড়াইয়ে ছেড়ে দেয়। আমি অবশ্য খেয়েছিলাম সেই মাছের ঝোল। এই হচ্ছে শিল্পীদের অবস্থা।

শিল্পীদের অন্দরমহলের খবর আমার মতো বেশি খুব কম লোকই জানে। কারণ, আমি তো এদের অন্দরমহলের ভেতরে গিয়ে কাজ করেছি। যে লোকটা পট আঁকছে, দশাবতার তাস আঁকছে, মূর্তি গড়ছে আমি তাদের বাড়ির ভেতর অবধি চলে গেছি তো। ফলে শিল্পের সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। আর সম্ভব মতো কিছু শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে রেখেছি। যেমন ঘুর্ণির মৃৎশিল্পের যে রিয়েলিস্টিক মডেল হয় তা আমার কাছে এক সেট আছে। এটা আমার একটা খুব প্রাউড কালেকশন। এখন আর এত ভালো কাজ পাওয়া যাবে না। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির যে দুর্গাঠাকুর হয় তার একটা মিনিয়েচার দু-হাজার টাকা দিয়ে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আমি করিয়েছি। সেটাও আমার কাছে আছে। এরকম আর একটা মিনিয়েচার দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়মে আছে। আমি নিজে ছবি আঁকতে না পারলেও শিল্পের প্রতি টানটা আমার বরাবরই আছে। ছবি যে আঁকতে পারিনি তার কারণ ছোটবেলাতেই বুঝেছিলাম একসঙ্গে সব কাজ হয় না। জীবন থেকে কিছু জিনিস বেদনার সঙ্গেই বাদ দিতে হয়। ছবি আঁকতে গেলে তার জন্য একটা আলাদা সময়, আলাদা মনঃসংযোগ লাগে, সে দুটো আমার ছিল না। আর গানের ব্যাপারটাও তাই। তারজন্যও তালিম নিতে হয়, রোজ সকালে রেওয়াজ করতে হয়। তা না হলে গান থাকে না। কাজেই ওই দুটো জায়গাতেই আমি একটু পথিকবৃত্তি করলাম আর কি। আর আমার নিজের জগৎটা লেখার জগৎ বলেই প্রতিপন্ন হল। লোকে আমাকে খুব গুরুগম্ভীর গবেষক-অধ্যাপক নাম দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আসলে আমি কিন্তু শিল্পেরই লোক।

- *স্কেচ দুটি শিল্পী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা। মূর্তি দুটি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের নমুনা। শেষ ছবিটি চালচিত্রের।*